ব্যালট বিপ্লব সংগঠিত করুন!

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিশেষ সমস্যা তুলে ধরতে

ইউপিডিএফ কর্তৃক মনোনীত স্বতন্ত্র প্রার্থী

খাগড়াছড়িতে উজ্জ্বল স্মৃতি চাকমা ও

বান্দরবানে ছোটন কান্তি তঞ্চঙ্গ্যাকে হাতি মার্কায়

ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করুন!

যোগ্য প্রার্থী নেই বিধায় ২৯৯ নং রাঙ্গামাটি আসনে

× না

ভোট দিন!

ভূমিকা

পার্বত্য চট্টগ্রামের বহুভাষী পাহাড়ি জাতিসত্তাগুলোর অস্তিত্ব চিরতরে বিলুপ্ত করে দেয়ার জন্য সুগভীর ষড়যন্ত্র চলছে। তাদের ওপর চালানো হয়েছে নির্দয় দমন পীড়ন। একের পর এক গণহত্যা চালিয়ে অসংখ্য নারী পুরুষ ও শিশু-বৃদ্ধকে হত্যা করা হয়েছে। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। বহু মা বোনের ইজ্জত হরণ করা হয়েছে। কল্পনা চাকমার অপহরণকারীদের কোন বিচার হয়নি। হাজার হাজার পরিবার ছন্নছাড়া হয়েছে; ঘরবাড়ি বসতভিটা থেকে তাদেরকে উচ্ছেদ ও দেশ ত্যাগে বাধ্য করা হয়েছে। দুই দশক আগেও পাহাড়ি অধ্যুষিত রামগড়, ফেনী, তবলছড়ি, লামা, আলিকদমসহ বহু এলাকা ইতিমধ্যে সেটলার অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। ১৯৯৭ সালে ২ ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত চুক্তির পরও শাসকগোষ্ঠির এই গণবিরোধী নীতির কোন পরিবর্তন হয়নি। এই অসম্পূর্ণ ও বিতর্কিত চুক্তিতে জনগণ অধিকার ফিরে পায়নি; চিরবঞ্চিত দুঃখী মানুষের মলিন মুখে হাসি ফোটেনি। নিপীড়ন নির্যাতন আগের মতোই রয়ে গেছে। সারা পার্বত্য অঞ্চল এখনো যেন এক কারাগার, সেনা নিয়ন্ত্রণে জনগণ এখানে বন্দী। মুক্তির আকাঙ্খায় তারা ছটফট করছে। এমনই এক ক্রান্তিলগ্নে নতুন যুগের পার্টি ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) আসন্ন নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছে। এই নির্বাচন পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এটা সবার কাছে আজ পরিষ্কার যে, একমাত্র লড়াই সংগ্রামের মাধ্যমে জনগণের ন্যায্য অধিকার অর্জিত হতে পারে। আর সংসদে প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষমতা অর্জন হলো এই লড়াই সংগ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। এই হাতিয়ার জনগণ আর হাতছাড়া করতে রাজী নয়। ইউপিডিএফ আপামর জনগণের এই আকাঙ্খাকে ধারণ করে নির্বাচনের প্রাক্কালে নিম্নোক্ত বক্তব্য উপস্থাপন করছে:

প্রথম অংশ

বহু রক্ত ক্ষয় অমূল্য জীবন-সম্পদহানি অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশার মধ্য দিয়ে দীর্ঘ এক দশকের বেশি সময় অতিক্রান্ত হলো। বর্তমানে দেশে জরুরি অবস্থা জারি রয়েছে। সাধারণ মানুষের দুঃসহ দিন কাটছে। একের পর এক আঘাত মানুষের জীবন বিপর্যস্ত করে তুলেছে। মুখ ফুটে কথা বলা বা প্রতিবাদ করার অবস্থা নেই। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান যে 'পার্বত্য চুক্তির' মাধ্যমে হয়নি তা দিবালোকের মতো স্পষ্ট। খোদ চুক্তি সম্পাদনকারী দু'পক্ষ আওয়ামী লীগ ও জনসংহতি সমিতি খোলাখুলি তা স্বীকারও করছে। এজন্য তারা পরস্পরকে দায়ী করছে। এক পক্ষ প্রকাশ্যে বক্তব্য-বিবৃতি দিয়ে বিলাপ করছে, দোষ দিচ্ছে অপর পক্ষকে। অন্য পক্ষটি ক্ষমতায় গেলে চুক্তি বাস্তবায়ন করবে বলে আবারও ছেলেভুলানোর প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। এই হচ্ছে 'পার্বত্য চুক্তির' দশা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান অবস্থা।

১। আন্দোলনের বিকল্প নেই

দুনিয়ার কোথাও কারোর সহানুভূতি করুণা-দয়া-দাক্ষিণ্যে নির্যাতিত জনগণের অধিকার অর্জিত হয়নি, সে ধরনের দৃষ্টান্ত নেই। দালালি-বেঈমানি কানাগলিতে গিয়ে কোন জাতি এ যাবত বৃহৎ কিছু অর্জন করতে পারেনি। পার্বত্য চট্টগ্রামেও এর ব্যতিক্রম হওয়া সম্ভব ছিল না এবং হয়ও নি।

অধিকারহারা জনতার অধিকার আদায়ের একমাত্র পথ হচ্ছে আন্দোলন সংগ্রাম, দালালি-ষড়যন্ত্র চক্রান্ত নয়। আন্দোলনের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন একটি পার্টি। পার্টিই লড়াই সংগ্রাম সংগঠিত করে ও নেতৃত্ব দেয়। সংগঠন ছাড়া ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে এককভাবে আন্দোলন পরিচালনা সম্ভব নয়। বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্তভাবে কোথাও কোথাও স্থানীয়ভাবে প্রতিবাদ বিক্ষোভ গড়ে তোলা সম্ভব হলেও, দীর্ঘকাল তা চালিয়ে নেয়া সম্ভব হয় না। অতীতে বিভিন্ন অঞ্চলে নানান দাবিতে গড়ে ওঠা স্থানীয় জনতার প্রতিবাদ বিক্ষোভ সফল না হবার মূল কারণও হচ্ছে নিজস্ব সংগঠন না থাকা।

২। দরকার নিজস্ব সংগঠন

নির্যাতিত মানুষের একমাত্র অবলম্বন হলো নিজস্ব পার্টি -- একটি অগ্রসর সংগঠন। বলা হয়ে থাকে সংগঠনই হচ্ছে নির্যাতিত নিপীড়িতদের একমাত্র হাতিয়ার। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণেরও অধিকার আদায়ের একমাত্র হাতিয়ার হচ্ছে নিজেদের পার্টি। আওয়ামী লীগ-বিএনপি-জাতীয় পার্টি-এলডিপি-জামাত ইত্যাদি দল পার্বত্যবাসীদের নিজস্ব পার্টি নয়, প্রগতিশীল অগ্রসর চিন্তাধারার দল হিসেবেও বিবেচিত হয় না। রাজনৈতিক বিচারের মানদণ্ডে এসব দল হচ্ছে মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া দল। এদের চরিত্রই হচ্ছে পরগাছাবৃত্তি, এরা আত্মমর্যাদাহীন। পারসেন্টিজ ভোগ-দালালি আর লুটপাটই এদের অবলম্বন, উৎপাদনমুখী আর সৃষ্টিশীল কাজে এরা অনীহ। ফলশ্রুতিতে স্বাধীনতার পর পরই দেশে লুটপাট বেড়ে যায়। এ ধরনের দল রাষ্ট্রের শাসনভার গ্রহণ করায় গোটা দেশ লাটে উঠেছে। দুনিয়ায় পঞ্চম বারের মতো দুর্নীতিতে বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন হবার "কৃতিত্ব" এ সব দল ও

গোষ্ঠীসমূহের। দেশের সাধারণ নাগরিকগণ পাহাড়ে কী সমতলে কেউ আসলে দুর্নীতি, অন্যায় জবর দখল, লুটপাট, হানাহানি আর অরাজকতা পছন্দ করেন না। সবাই মানুষের মতো সম্মান-মর্যাদা আর অধিকার নিয়ে শান্তিতে বসবাস করতে চান। লুটেরা শাসকগোষ্ঠীই নিজেদের ক্ষমতা নির্বিঘ্ন করতে জনগণের এক অংশকে অন্যের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিয়ে কৃত্রিম দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ হচ্ছে এ ষড়যন্ত্রের নিষ্ঠুর শিকার।

বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলন এগিয়ে নেয়ার দৃপ্ত প্রত্যয় নিয়ে সময়ের দাবিতে আবির্ভূত হয়েছে ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)। ইউপিডিএফই এ সময়ে জনগণের নিজস্ব সংগঠন বা পার্টি।

৩। ভুঁইফোঁড় সংগঠনের আত্মপ্রকাশ, রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধন জটিলতা

অত্যাচারী শাসকচক্র অধিকারহারা লাঞ্ছিত জনগণকে কখনই সংগঠিত হতে দিতে চায় না। নিজেদের ক্ষমতার গদি নিরাপদ রাখতে এরা নানান ছলা-কলায় জনগণকে বিভক্ত করে রাখে। জনতার উত্থান ঠেকাতে অর্থ-অস্ত্র-প্রচারসহ সমস্ত ধরনের সরকারি সুযোগ-সুবিধা ও আনুকূল্য দিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল ঠ্যাঙ্গারে বাহিনী ও সংগঠন মাঠে নামিয়ে দেয়। পূর্বের মতো এবারও ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিতব্য নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে পার্টির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হয়েছে। জরুরি অবস্থার মধ্যে ক্ষমতাশালী চক্রের প্রত্যক্ষ মদদে পার্বত্য চট্টগ্রামে ও দেশে ক্ষমতাসীনদের তল্পিবাহক মুখচেনা কতিপয় দল ও উগ্র সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটেছে। জরুরি অবস্থার কারণে রাজনৈতিক দলের অফিসে তালা ঝুললেও কতিপয় চিহ্নিত গোষ্ঠী-চক্র নির্বিঘ্নে মিটিঙ-সংবাদ সম্মেলন করেছে এবং "সংগঠনের" আত্মপ্রকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। রাজনৈতিক দল হিসেবে নির্বাচন কমিশনে এ সব খুচরো দল অনায়াসে নিবন্ধনও লাভ করে। অথচ পার্বত্য চট্টগ্রামের দু'টি আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল ইউপিডিএফ ও জনসংহতি সমিতিসহ দেশের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দলকে নিবন্ধন থেকে বাদ দেয়া হয়েছে।

ইউপিডিএফ ও জনসংহতি সমিতিকে রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধন না দেয়ার পেছনে নির্বাচন কমিশনের জোরালো কোন যুক্তি-ভিত্তি নেই। ইউপিডিএফ বিগত ২০০১ সালের অষ্টম সংসদ নির্বাচনে খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটি আসনে প্রার্থী দিয়ে দল হিসেবে নিজের গণভিত্তি প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে। বাতিল হওয়া ২০০৭ সালের ২২ জানুয়ারির নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য ইউপিডিএফ নিবন্ধন লাভ করেছিল এবং দলীয় প্রতীক হিসেবে তীর-ধনুকও বরাদ্দ হয়।

২৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে পূরণযোগ্য সকল শর্তই ইউপিডিএফ-এর পক্ষ থেকে পূরণ করা হয়। দল হিসেবে নিবন্ধন না দেয়ার পেছনে নির্বাচন কমিশন যে কারণ প্রদর্শন করে তা খুবই দুর্বল। নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রদর্শিত তিনটি কারণ সম্পর্কে ব্যাখ্যা বা সংশোধনের জন্য ১৫ দিন সময় দেয়া আবশ্যক (সে আইন নির্বাচন কমিশনই করেছে)। অথচ সে সময় দেয়া হয়নি।

নির্বাচনের দিন-ক্ষণ ও তফশীল নির্ধারণ করতে দেশের অন্যান্য রাজনৈতিক দলের

সাথেও কয়েক দফায় নির্বাচন কমিশন বৈঠক করেছে। বার বার বৈঠকে বসেছে বিশেষ শ্রেণীর দু'টি দলের সাথে। তাদের প্রস্তাব ও দাবি মতো নির্বাচনের তফশীল ও দিন-তারিখ বারে বারে পরিবর্তনও করেছে। মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার আগের দিন পর্যন্ত বিশেষ সুবিধে দিয়ে খালেদা জিয়াসহ অনেককে ভোটারও করেছে। অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের দু'টি দলের একটিকেও নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে আহুত বৈঠক সমূহে একবারের জন্যও আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। প্রস্তাবনা শোনা বা দাবি পূরণ তো দূরের কথা। স্পষ্টতঃই এটি বৈষম্যমূলক আচরণ, বিশেষ দলের প্রতি পক্ষপাতমূলক এবং এতে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের জনগণকে উপেক্ষা করা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ যাতে নিজস্ব পার্টির পতাকাতলে সমবেত হয়ে স্বকীয়তা-স্বাতন্ত্র তুলে ধরতে সক্ষম না হয়, আওয়ামী লীগ-বিএনপি-জাতীয় পার্টি-এলডিপি ইত্যাদির সাথে যুক্ত হয়ে নিজেরা বিভক্ত হয়ে পড়ে, দলাদলি-হানাহানি করে মশগুল থাকে এবং নিজেরা যাতে সংগঠিত হয়ে আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম না হয়--সে লক্ষ্যেই সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে এটা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে শাসকচক্র অনেক দূর সফল তা উদ্বেগের সাথে লক্ষণীয়।

একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে নির্বাচন কমিশন দল হিসেবে আমন্ত্রণ না জানাক বা রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধন না দিক, একজন নাগরিক হিসেবে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে বাধ্য। সে দায়িত্ব সম্পাদনের জন্যই নির্বাচন কমিশনের কর্তা ব্যক্তিরা উক্ত সাংবিধানিক পদ লাভ করেছেন। দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে এ সংবিধান স্বীকৃত নাগরিক অধিকার থেকেও পার্বত্য চট্টগ্রামবাসীকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এমনকী প্রার্থী হিসেবে ভোটার হতে চেয়েও ইউপিডিএফ-এর সভাপতিকে ভোটার করা হয়নি। এটি নির্বাচন কমিশনের অনেক মহৎ উদ্যোগের মাঝে নাগরিক অধিকারহরণের এক কলঙ্ক তিলক হিসেবে লেপ্টে থাকবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

একদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের আঞ্চলিক দল দু'টিকে উপেক্ষা আর অন্যদিকে মুখচেনা বিশেষ কয়েকটি দলের প্রতি নির্বাচন কমিশনের পক্ষপাতমূলক আচরণ অত্যন্ত বেদনাদায়ক। পার্বত্য চট্টগ্রামের ভিন্ন জাতিসত্তার নাগরিকগণকে দেশের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবেই উপেক্ষা করা হয়েছে। নিরপেক্ষতা বজায় রাখার শপথ গ্রহণকারী নির্বাচন কমিশনের অঙ্গীকারের সাথে এসব আচরণ মোটেও সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

৪। জনসংহতি সমিতির নিবন্ধন ও কিছু কথা

পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্য রাজনৈতিক দল জনসংহতি সমিতি এ পর্যন্ত বয়কট করলেও '৭৩ সালে স্বাধীন বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত প্রথম নির্বাচনে অংশ নিয়েছিল। সে সময় জনগণের একমাত্র সংগঠন হিসেবে দু'টি আসনেই পার্বত্য চট্টগ্রামবাসী তাদের প্রার্থীদ্বয়কে ম্যান্ডেট দিয়েছিল। '৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর জনসংহতি সমিতিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের দল হিসেবে মেনে নিয়ে তৎকালীন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ চুক্তি সম্পাদন করে। দেশে-বিদেশে এ 'চুক্তিকে' ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে রেডিও-টিভি-পত্র-পত্রিকায় ব্যাপকভাবে প্রচার চালায়। চুক্তি সম্পাদনের "কৃতিত্বের" নিদর্শনস্বরূপ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ডজনের অধিক

বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি-উপাধি পেলেও, চুক্তি সম্পাদনকারী অপর পক্ষ জনসংহতি সমিতি রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধনও পেলো না।

ইউপিডিএফ বিতর্কীত পার্বত্য চুক্তি প্রত্যাখান করেছে। সন্তু লারমার নেতৃত্বাধীন জনসংহতি সমিতির রাজনীতি ও মত-পথের সাথেও ইউপিডিএফ-এর পার্থক্য রয়েছে। উভয় দলের তিক্ত সংঘাতও কারোর অজানা নয়। তা সত্ত্বেও ইউপিডিএফ এটি মনে করে পার্বত্য চট্টগ্রামের একটি দল হিসেবে জনসংহতি সমিতিকে নিবন্ধন দেয়া উচিত ছিল। দল হিসেবে সমিতির টিকে থাকা না থাকা সে সিদ্ধান্ত নেবেন সংগঠনের নেতা-কর্মিরা, নির্বাচন কমিশন বা বাইরের অন্য কোন সংস্থা নয়। সমিতির মূল নেতৃত্ব নীতি ও আদর্শভ্রষ্ট হওয়া এবং একটি উল্লেখযোগ্য অংশ চামচাগিরির পথ বেছে নেয়ার কারণে বর্তমানে তাদের ভেতরে বহুধা বিভক্তি থাকলেও, এটা ভুলে যাওয়া সমচীন হবে না যে সমিতিতে অনেক দেশপ্রেমিক নেতা-কর্মি রয়েছেন। সঠিক নেতৃত্ব পেলে এ অংশটি দেশ ও জনগণের জন্য কাঙ্খিত ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবেন বলে ইউপিডিএফ বিশ্বাস করে।

৫। হাইকোর্টে রিট

সারা দেশে অবাধ, সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের মতো একটি বিশেষ অঞ্চলের ভিন্ন ভাষা-ভাষী সংখ্যালঘু জাতিসমূহের পক্ষে দু'টি রাজনৈতিক দলের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য-প্রস্তাবনা থাকতে পারে (যা ইউপিডিএফ-এর আছে) সে বিবেচনাটুকু নির্বাচন কমিশনের নেই-- এটি রীতিমতো উদ্বেগজনক। নির্বাচন কমিশনের এ ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণ এবং সাংবিধানিক অধিকারহরণের প্রতিবাদে ইউপিডিএফ প্রথমে উকিল নোটিশ জারি করে এবং পরে হাইকোর্টে রিট করেছে। বিষয়টি এখন হাইকোর্টে মামলাধীন। হাইকোর্ট কর্তৃক ২ ডিসেম্বর জারিকৃত রুল নিশিতে দু'সপ্তাহের মধ্যে রাজনৈতিক দল হিসেবে ইউপিডিএফকে নিবন্ধন না দেয়া কেন অবৈধ ঘোষিত হবে না এই মর্মে নির্বাচন কমিশনসহ সরকারের বেশ ক'টি সংস্থার কাছে জবাব চাওয়া হয়েছে।

নির্বাচন কমিশন ক্ষমতার জোরে কলমের এক খোঁচায় ইউপিডিএফকে রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধন না করলেও, ২৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিতব্য নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পার্বত্য চট্টগ্রামবাসীই ইউপিডিএফ কর্তৃক সমর্থিত প্রার্থীকে ম্যান্ডেট দিয়ে রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধন দেবেন। আগামী নির্বাচন সে অর্থে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিজস্ব দলকে জাতীয় অঙ্গনে তুলে ধরা এবং প্রতিষ্ঠিত করাই হবে এখন পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ। মনে রাখা দরকার জনগণই হলো সকল ক্ষমতার উৎস, কোন বিশেষ সংস্থা কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি বিশেষ বা গোষ্ঠী নয়।

৬। মুখরোচক প্রতিশ্রুতিতে বিভ্রান্ত হবেন না

ভোট ঘনিয়ে এলে সারা দেশের মতো পার্বত্য চট্টগ্রামেও রঙ-বেরঙের জনদরদী ও প্রতিশ্রুতি দাতার আবির্ভাব ঘটে, আওয়ামী লীগ-বিএনপি-জাতীয় পার্টি-জামাত মার্কা জাতীয় দলসমূহ জনগণের সামনে উন্নয়ন প্রতিশ্রুতির লম্বা ফিরিস্তি হাজির করে। মানুষের

দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কোথাও উন্নয়নমূলক নানান প্রকল্প, অনুদান, কাউকে চাকরী-প্রমোশন-লাভজনক পদে বদলী-বড় চ্যানেল ধরিয়ে দেয়া, কাউকে ব্যবসা, ঠিকাদারি, লাইসেন্স, পারমিট পাইয়ে দেয়া...ইত্যাদি লোভ-টোপ দিয়ে এরা জব্দ করতে চায়। লজ্জাজনক হলেও সত্য যে, চিহ্নিত ব্যক্তিরা এতে ধরাশায়ীও হয়।

এটা পরিষ্কার করা দরকার যে, একজন জাতীয় সংসদ সদস্যের (এমপি) কাজ পাড়া-মহল্লার ছোটখাট উন্নয়নমূলক কাজে মশগুল থাকা নয়। ব্রিজ-কালভার্ট-নালা নির্মাণ সে ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ করার দায়িত্ব হচ্ছে ইউপি-পৌর সভা ও উপজেলা চেয়ারম্যান-মেম্বার-ওয়ার্ড কমিশনারদের। সংসদ সদস্যের কাজ হচ্ছে পুরোদস্তুর রাজনৈতিক। সংসদে আইন প্রণয়ন, সংশোধন, সরকারের কোন পদক্ষেপ বা কোন আইনী বিধি-ধারা-উপধারা যদি এলাকার জনস্বার্থের পরিপন্থী হয় তাহলে তার প্রতিবাদ জানানো। জনসাধারণের কাজে প্রশাসনের অন্যায় হস্তক্ষেপ ও খবরদারি বন্ধ করা, সরকারকে এলাকার জনসাধারণের স্বার্থে ক্ষতিকর পদক্ষেপ গ্রহণ থেকে নিবৃত্ত রাখা এবং জনগণের সার্বিক কল্যাণে নীতি প্রণয়নে ভূমিকা রাখা। পার্বত্য চট্টগ্রামের বেলায় এটি আরো বেশি সত্য। কারণ এটি এক বিশেষ অঞ্চল। এ অঞ্চলের ভিন্ন ভাষা-ভাষী জাতিসত্তাসমূহকে আজ পর্যন্ত কোন সরকারই সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেয়নি। সংখ্যালঘু জাতিসমূহ নিজদেশে পরবাসী এবং সাংবিধানিক অধিকারহীনভাবে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের মতো জীবন-যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। তাদের বংশপরম্পরার জায়গা-জমি থেকে উচ্ছেদ করার লক্ষ্যে নিপীড়ন-নির্যাতন-নারী ধর্ষণ-হত্যাযজ্ঞ অব্যাহত রয়েছে।

অত্যন্ত দুঃখজনক ও উদ্বেগের ব্যাপার হলো যে, '৭৯ সালের পর থেকে এ পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে নির্বাচিত কোন সংসদ সদস্যই পার্বত্য চট্টগ্রামের এই গুরুতর সমস্যার ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কোন বক্তব্য বিবৃতি দেয়নি। এত হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ সংঘটিত হলো তার প্রতিবাদে কোন কিছুই করেননি। উল্টো সে সব ঘটনা ধামাচাপা দিতে তথাকথিত জাতীয় দলের নির্দেশ মেনে চলেছেন! যতটা না তারা জনপ্রতিনিধি, তার চাইতে বেশি দলীয় কর্মী। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি নিয়ে এ ধরনের দুর্দশায় পড়ার পেছনে দায়ী পাহাড়িদেরই মধ্যকার একটি চক্রের রাজনৈতিক অদূরদর্শীতা ও অপরিণামদর্শী চিন্তা। এ দীর্ঘ সময় সংসদে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে নিজস্ব প্রতিনিধি প্রেরণ করতে না পারার ব্যর্থতা জনগণের নয়। পরিকল্পিতভাবে তথাকথিত "জাতীয় দলের" দিকে জনগণকে ঠেলে দেয়া, "জাতীয় দলের" লেজ ধরে নির্বাচনী বৈতরণী পার হবার আত্মঘাতী "তত্ত্ব উদ্ভাবন"-- পার্বত্য চট্টগ্রামের লড়াই সংগ্রামে রাজনৈতিক দেউলিয়াপনার লজ্জাকর দৃষ্টান্ত। এ তত্ত্বের সারবত্তা হলো জাতীয় মনোবল ও আত্মবিশ্বাস ধ্বংস করে পরমুখাপেক্ষী-পরগাছা মনোবৃত্তি গ্রহণ, যার চূড়ান্ত পরিণতিই হচ্ছে আত্মসমর্পণ। আন্দোলনকারী জাতির আত্মবিশ্বাস-মনোবল হচ্ছে প্রধানতম হাতিয়ার। আত্মবিশ্বাস ও মনোবলহীন জাতির পক্ষে কোন কিছুই করা সম্ভব নয়।

ভবিষ্যতেও যদি কোন জাতীয় দলের প্রার্থী নির্বাচনে জিতে সংসদে যায়, তাহলে এটা আগাম বলে দেয়া দরকার তার পক্ষে দলের সিদ্ধান্তের বাইরে আলাদা কোন বক্তব্য-বিবৃতিদান সম্ভব হবে না। বাংলাদেশের সংসদীয় বিধি মোতাবেক কোন সাংসদ দলের

সিদ্ধান্তের বাইরে কিছু বলতে পারেন না। তা করতে গেলে তাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হবে। দল থেকে বহিষ্কারের অর্থ হচ্ছে সংসদ সদস্যপদও বাতিল হয়ে যাওয়া। যিনি দলের সিদ্ধান্তের বাইরে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের পক্ষে কথা বলার অঙ্গীকার করছেন, তিনি জেনেশুনেই মিথ্যা আশ্বাস দিচ্ছেন। এ ধরনের লোককে মতলববাজ ছাড়া আর কিছু বলা চলে না, মনে রাখা দরকার এরা হলেন ভয়ঙ্কর। ইউপিডিএফ ব্যক্তিস্বার্থোদ্ধারে নিযুক্ত এ ধরনের মতলববাজদের কথায় কর্ণপাত না করতে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকে আহ্বান জানাচ্ছে।

৭। অন্যান্য রাজনৈতিক দলসমূহের ইশতেহার সম্পর্কে :

আসন্ন নবম জাতীয় সংসদের প্রাক্কালে আবারও পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকে ধোঁকা দিয়ে নিজেদের পক্ষে মূল্যবান ভোট হাতিয়ে নিতে দেশের বেশ ক'টি জাতীয় দল তাদের ইশতেহার প্রকাশ করেছে।

ক. আওয়ামী লীগ : অত্যন্ত চাতুর্যের সাথে ইশতেহারে আপত্তিকর 'উপজাতি' শব্দ ব্যবহার থেকে বিরত থেকেছে, যা লক্ষণীয় অবশ্যই। শেখ মুজিব পাহাড়িদের বাঙালি হয়ে যাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন, তা শুধরানোর সুযোগ থাকলেও আওয়ামী লীগ এ ব্যাপারে এখনও মৌনব্রত পালন করছে! 'পার্বত্য চুক্তির' মূল দলিল ও আওয়ামী লীগের দলীয় কাগজপত্রে এখনও 'উপজাতি' লেখা রয়েছে, সে সব সংশোধন করা হয়নি। ক্ষমতায় গেলে আওয়ামী লীগ সংখ্যালঘু জাতিসমূহকে 'উপজাতি' সম্বোধন করে হেয়প্রতিপন্ন করবে না ইশতেহারে এমন কোন ঘোষণা নেই। আর সংবিধানে জাতিসত্তার স্বীকৃতি দেবে কীনা তারও কোন অঙ্গীকার নেই। এটি নিছক আওয়ামী লীগের ভোট আদায়ের কৌশল কীনা সে সংশয় থেকে যাবে।

নির্বাচনী ইশতেহারের ১৮.২ অংশে উল্লেখ রয়েছে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা হবে।' স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন এসে যায় তাহলে '৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন করার জন্য আওয়ামী লীগ চুক্তি করেনি? যার ফলে '০৮ সালে দীর্ঘ একদশক পরে আবার সম্পূর্ণ বাস্তবায়নের ওয়াদা দিতে হচ্ছে আওয়ামী লীগকে। "চুক্তির সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন" ধোঁয়াশা ও লোক ঠকানোর কথাবার্তা ছাড়া কিছুই নয়। চুক্তির "সম্পূর্ণ" ও "অসম্পূর্ণ" অংশ বলতে আওয়ামী লীগ আসলে কী বোঝাতে চায় তা পরিষ্কার করেনি। ক্ষমতায় থাকাকালে এ ব্যাপারে চুক্তির অপর পক্ষ জনসংহতি সমিতির সাথে আওয়ামী লীগের বৈরীতাও সৃষ্টি হয়েছিলো।

প্রতিশ্রুতি দেয়া আর তা বাস্তবায়ন যে এক নয়, সে ব্যাপারে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ জানেন। '৯৭ সালে লিখিত চুক্তির বাইরে "অলিখিত চুক্তির" কথাও ফাঁস করে দিচ্ছে জনসংহতি সমিতি। লিখিত চুক্তি যেখানে বাস্তবায়িত হয়নি, অলিখিত চুক্তি তো আরো দূরের কথা।

চুক্তি বাস্তবায়নের চাইতেও অতি সহজ কাজ হচ্ছে রাজনৈতিক কারণে আটক বন্দীদের বিনাশর্তে মুক্তিদান, শান্তিবাহিনী থাকাকালে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহার এবং সংবিধানে জাতিসত্তার স্বীকৃতিদান-- এ সব মৌলিক বিষয় আওয়ামী লীগ বেমালুম

চেপে গেছে। কঠিন কাজ বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি, অথচ মৌলিক ও সাধারণ ব্যাপারে নিরবতা পালন--এটি পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকে আশ্বস্ত করার মতো নয়।

তাছাড়া চুক্তির কোথাও 'শান্তিচুক্তি' লেখা ছিলো না, চুক্তি সম্পাদনকারী অপর পক্ষ জনসংহতি সমিতিও 'শান্তিচুক্তি' বলতে নারাজ। তা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ বিভ্রান্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে একতরফাভাবে 'শান্তিচুক্তি' আখ্যা দিচ্ছে। চুক্তির ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে আদৌ শান্তি আসেনি তা সর্বজন বিদিত।

নির্বাচনী ইশতেহারে ১৯৯৬-২০০১ সালকে আওয়ামী লীগ নিজ সরকারের সাফল্যের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়, আর তার পরবর্তী বিএনপি'র পাঁচ বছরের শাসনকালকে দুর্নীতি ও দুঃশাসনের কাল হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। এও বলেছে বিএনপি'র শাসনামলে দেশ মৃত্যু-উপত্যকায় পরিণত হয়েছে, অভিযোগটি মিথ্যে নয়। আর এটাও সত্য যে, আওয়ামী লীগের শাসনামলে পার্বত্য চট্টগ্রাম মৃত্যু-উপত্যকায় পরিণত হয়েছিলো। সারাদেশে কর্মীবাহিনী দিয়ে বিএনপি যে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা-তান্ডবলীলা-সন্ত্রাস চালিয়েছিলো, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকাকালে পার্বত্য চট্টগ্রামে একই কান্ড ঘটিয়েছিলো। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকে রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত করার মূল হোতা হচ্ছে আওয়ামী লীগ, এ কথাটি কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না।

পার্বত্য চট্টগ্রামের ইস্যু ছাড়াও আওয়ামী লীগের নির্বাচনে বহু গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ইস্যু অস্পষ্ট। চটকদার অনেক কথাবার্তা থাকলেও আওয়ামী লীগের মতো একটি দলের পক্ষে সে সব বিষয় আদৌ বাস্তবায়ন সম্ভব কীনা অভিজ্ঞমহলের সে সংশয় থেকে যাবে। বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ, রেডিও-টিভির স্বায়ত্তশাসন, স্থানীয় সরকারের নির্বাচন, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার-এর মতো জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ইশতেহারে সুনির্দিষ্ট কোন বক্তব্য নেই। বহুজাতিক কোম্পানী ও সংস্থার সাথে সম্পাদিত বিভিন্ন চুক্তি, বিতর্কিত তেল-গ্যাস-কয়লা অনুসন্ধান ও উত্তোলন সংক্রান্ত চুক্তির ব্যাপারে আওয়ামী লীগ কী পদক্ষেপ নেবে সে বিষয়েও কোন নির্দেশনা নেই।

অন্ধ সমর্থনের বশে ঘোরতর আওয়ামী সমর্থকরা আহ্লাদিত হলেও, রাজনীতি সচেতন নাগরিকের পক্ষে চটকদার ইশতেহার দেখে আশাবাদী হবার মতো ভিত্তি নেই। 'পার্বত্য চুক্তি' সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন ঘোষণায় থাকলেও, তা করা আওয়ামী লীগের পক্ষে কতদূর সম্ভব সন্দেহ থেকে যায়। সংসদে আওয়ামী লীগ এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে সক্ষম হবে না, তা স্পষ্ট। মহাজোটে অন্যতম প্রধান শরীক সংগঠন হচ্ছে এরশাদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টি। পার্বত্য চট্টগ্রাম ইস্যুটিই জাতীয় পার্টির নির্বাচনী ইশতেহারে স্থান পায়নি। এরশাদের জাতীয় পার্টির সমর্থন ছাড়া আওয়ামী লীগের পক্ষে এককভাবে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হবে না।

কোয়ালিশন সরকার সাধারণতঃ দুর্বলই হয়ে থাকে। জোটভুক্ত দলসমূহের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, নীতিগত সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হয় না। সমমনা দলের মধ্যেও দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। আর আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোটে সমবেত হয়েছে গণধিকৃত স্বৈরশাসক এরশাদসহ বাম-ডান-মধ্যম নানান রঙ-বেরঙের দল। জোটে অন্যতম প্রধান শরীক সংগঠন হিসেবে এরশাদের জাতীয় পার্টিরই কদর ও প্রভাব লক্ষণীয়, বামপন্থী নামধারী ছোটখাট দলসমূহ

উপেক্ষিত। পার্বত্য চট্টগ্রাম এমনিতেই প্রান্তিক অবস্থানে, জোটের টানাপোড়নে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ উপেক্ষিত হবেন, 'পার্বত্য চুক্তি' বাস্তবায়ন ঝুলে থাকবে অতীতের মতো--তার আলামত দেখা গেছে জোট গঠনের ভাঙা-গড়া খেলায়।
কাজেই নিজেদের প্রার্থী নির্বাচিত করেই পার্বত্য চট্টগ্রামবাসীদের প্রস্তুত থাকতে হবে। আগামীতে যে জোটই সরকার গঠন করুক, চাপ প্রয়োগ করে অধিকার আদায় করা ছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামবাসীদের সামনে অন্য কোন বিকল্প নেই।

খ.বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) : পার্বত্য চট্টগ্রাম ইস্যুটি বিএনপি'র অগ্রাধিকার তালিকায় স্থান দেবার মতো কোন বিষয় নয়, তা দলীয় ইশতেহারই বলে দেয়। অসম্মানজনক আপত্তিকর 'উপজাতি' আখ্যায়িত করে বিএনপি পার্বত্য চট্টগ্রামের ভিন্ন ভাষা-ভাষী জাতিসত্তাসমূহকে তাচ্ছিল্য ও হেয়প্রতিপন্ন করেছে। শিক্ষিত সচেতন নাগরিকগণ যে ভাষা পরিহার করেন, বিএনপি নীতি নির্ধারকরা তা উৎসাহের সাথে আঁকড়ে ধরে রয়েছেন, ভাবতেও ঘেন্না হয়। এতে দলগতভাবে বিএনপি কতখানি পশ্চাদপদ, ঘুণেধরা ও প্রতিক্রিয়াশীল ধ্যান-ধারণায় আচ্ছন্ন তাই প্রকাশ পায়।
স্মরণ করা যেতে পারে, বিএনপি'র শাসনামলেই পার্বত্য চট্টগ্রামে ভয়াবহ লোগাঙ হত্যাযজ্ঞ (১০ এপ্রিল '৯২) সংঘটিত হয়েছে। '৯১সালে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে খালেদা জিয়া পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকে লোগাঙ হত্যাযজ্ঞ, নান্যাচর হত্যাযজ্ঞ উপহার দিয়েছিলেন! '০১ সালের অক্টোবরে ক্ষমতায় এসে মহালছড়ি ধ্বংসযজ্ঞ (২৬ আগস্ট '০৩), মাইসছড়ি ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের সাধারণ মানুষের অশ্রু ঝরানো, রক্তক্ষয়, বাস্তুভিটা-জায়গা-জমি কেড়ে নেয়ার ক্ষেত্রে বিএনপি অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে। অন্যান্য অধিকার দেয়া তো দূরের কথা, ২০০৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের আগ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীপদটি পর্যন্ত কব্জা করে রেখেছিলেন।

নির্বাচনী ইশতেহারে অতীত কর্মকান্ডের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামবাসীর কাছে ক্ষমা চাওয়ার সৌজন্যতা প্রদর্শনের ছিটেফোটাও নেই। পুরো ইশতেহারে পার্বত্য চট্টগ্রাম ইস্যুটি প্রান্তিক এবং উপেক্ষিত হয়েছে। পাহাড়িদের অত্যন্ত খাটো করে দেখানো হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সমতল অঞ্চলের ক্ষুদ্র জাতি ও সম্প্রদায় জনগোষ্ঠীকে বৃহৎ জাতিসুলভ দম্ভভরে অবজ্ঞা করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ ব্যালটের মাধ্যমেই এ ঔদ্ধত্যের জবাব দেবেন।

গ. বাংলাদেশ জামাতে ইসলামী (জামাত) : বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোটভুক্ত অন্যতম শরীক দল জামাত নির্বাচনী ইশতেহারে চট্টগ্রাম ও ক্ষুদ্র জাতিসত্তা শিরোনাম দিয়ে তিন প্যারার নীতি ঘোষণা করেছে, বলার অপেক্ষা রাখে না গুরুত্বের বিচারে তা প্রান্তিক। বিএনপি'র চাইতে রাজনীতিতে সিদ্ধহস্ত এটা প্রদর্শন করতে চাইলেও জামাতের ভেতরের আসল রূপ বেরিয়ে এসেছে। শিরোনামে ক্ষুদ্র জাতিসত্তা উল্লেখ করা হলেও

বক্তব্যে আপত্তিকর 'উপজাতি' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এতে জামাতের স্থূল চালাকি ধরা পড়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যাপারে জামাতের দৃষ্টিভঙ্গী স্ববিরোধী এবং বিভ্রান্তিকর। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের সব ধরনের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার কথা বললেও কীভাবে জামাত তা করবে তার আভাস নেই। সংবিধান পরিবর্তন করে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহকে স্বীকৃতি দেবার ব্যাপারে জামাত রহস্যজনকভাবে নিরব।

দেশে সশস্ত্র ইসলামী জঙ্গীদের দমনের ব্যাপারে জামাতের সুস্পষ্ট কোন বক্তব্য নেই, বিএনপি-জামাত জোট সরকারের আমলে এসব জঙ্গীগোষ্ঠী মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। সারা দেশে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ইসলাম কায়েমের অভ্যুত্থান ঘটাতে চেয়েছিলো, তার সাথে জামাতের কতিপয় প্রভাবশালী নেতার সংশ্লিষ্টতার কথা ওপেন-সিক্রেট বিষয়।

'৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বন, হানাদার বাহিনীর সহযোগী হয়ে নিরীহ মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া, বহু হত্যাযজ্ঞ ঘটানোর প্রধানতম হোতা হচ্ছে জামাত। স্বাধীনতা বিরোধী হিসেবে জামাতের খ্যাতি সর্বজনবিদিত। গোটা দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষার ব্যাপারে জামাতের নীতি-কর্মসূচি ইশতেহারে উল্লেখ নেই, কেউ জানেও না। অথচ পার্বত্য চট্টগ্রামে স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে জেহাদ ঘোষণা করে জামাত দেশপ্রেমিকের বেশ ধরছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামবাসীদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনের প্রতি ইঙ্গিত করে নির্বাচনী ইশতেহারে জামাত তা কঠোর হস্তে দমনের হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছে। '৭১ সালে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর দোসর জল্লাদগিরিতে অভ্যস্ত জামাত পুরোণ পেশায় নিযুক্ত হবার খায়েশ পোষণ করছে। ক্ষমতায় না যেতে এখন থেকেই জামাত পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকে ধমক দিচ্ছে, আর সরকার গঠন করতে সক্ষম হলে জামাত কী করবে?

ঘ. জাতীয় পার্টি (জাপা-এরশাদ) : নির্বাচনী ইশতেহারে জাপা পার্বত্য চট্টগ্রাম ইস্যুটি পুরোপুরিই উহ্য রেখেছে। আওয়ামী নেতৃত্বাধীন মহাজোটের অন্যতম প্রধান শরীক হচ্ছে জাপা। 'পার্বত্য চুক্তির' সম্পূর্ণ বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি রয়েছে আওয়ামী লীগের, আর শরীক সংগঠন জাপার ইশতেহারে পুরো ইস্যুটিই গায়েব। জাপার সমর্থন ছাড়া আওয়ামী লীগের পক্ষে এককভাবে চুক্তি বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের সাথে প্রতারণা করতে এটি আওয়ামী লীগ-জাপার গোপন সমঝোতার ফল কিনা সে সংশয় রয়েছে।

জিয়ার পদাঙ্ক অনুসরণ করে স্বৈরশাসক এরশাদ পুরো পার্বত্য চট্টগ্রামকে সেনা ছাউনিতে পরিণত করেছিলেন। মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে ৪ লক্ষাধিক সেটলারকে পাহাড়িদের জায়গায় পুনর্বাসন, সেনা-সেটলার দিয়ে পাহাড়ি বসতিতে হামলা-দাঙ্গা-নারী ধর্ষণ-হত্যাযজ্ঞ-বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ করে ত্রিপুরায় শরণার্থী হতে বাধ্য করা...এ ধরনের বর্বরোচিত ঘটনার একক "কৃতিত্ব" হচ্ছে স্বৈরশাসক এরশাদের। লংগদু-ফেনী-মাটিরাঙ্গা-ভূষণছড়া-হীরাচর হত্যাকাণ্ড এরশাদের গলায় পেশাদার জল্লাদগিরির সনদ হয়ে ঝুলছে।

বক্তব্যে আপত্তিকর 'উপজাতি' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এতে জামাতের স্থূল চালাকি ধরা পড়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যাপারে জামাতের দৃষ্টিভঙ্গী স্ববিরোধী এবং বিভ্রান্তিকর। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের সব ধরনের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার কথা বললেও কীভাবে জামাত তা করবে তার আভাস নেই। সংবিধান পরিবর্তন করে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহকে স্বীকৃতি দেবার ব্যাপারে জামাত রহস্যজনকভাবে নিরব।

দেশে সশস্ত্র ইসলামী জঙ্গীদের দমনের ব্যাপারে জামাতের সুস্পষ্ট কোন বক্তব্য নেই, বিএনপি-জামাত জোট সরকারের আমলে এসব জঙ্গীগোষ্ঠী মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। সারা দেশে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ইসলাম কায়েমের অভ্যুত্থান ঘটাতে চেয়েছিলো, তার সাথে জামাতের কতিপয় প্রভাবশালী নেতার সংশ্লিষ্টতার কথা ওপেন-সিক্রেট বিষয়।

'৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বন, হানাদার বাহিনীর সহযোগী হয়ে নিরীহ মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া, বহু হত্যাযজ্ঞ ঘটানোর প্রধানতম হোতা হচ্ছে জামাত। স্বাধীনতা বিরোধী হিসেবে জামাতের খ্যাতি সর্বজনবিদিত। গোটা দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষার ব্যাপারে জামাতের নীতি-কর্মসূচি ইশতেহারে উল্লেখ নেই, কেউ জানেও না। অথচ পার্বত্য চট্টগ্রামে স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে জেহাদ ঘোষণা করে জামাত দেশপ্রেমিকের বেশ ধরছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামবাসীদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনের প্রতি ইঙ্গিত করে নির্বাচনী ইশতেহারে জামাত তা কঠোর হস্তে দমনের হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছে। '৭১ সালে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর দোসর জল্লাদগিরিতে অভ্যস্ত জামাত পুরোণ পেশায় নিযুক্ত হবার খায়েশ পোষণ করছে। ক্ষমতায় না যেতে এখন থেকেই জামাত পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকে ধমক দিচ্ছে, আর সরকার গঠন করতে সক্ষম হলে জামাত কী করবে?

ঘ. জাতীয় পার্টি (জাপা-এরশাদ) : নির্বাচনী ইশতেহারে জাপা পার্বত্য চট্টগ্রাম ইস্যুটি পুরোপুরিই উহ্য রেখেছে। আওয়ামী নেতৃত্বাধীন মহাজোটের অন্যতম প্রধান শরীক হচ্ছে জাপা। 'পার্বত্য চুক্তির' সম্পূর্ণ বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি রয়েছে আওয়ামী লীগের, আর শরীক সংগঠন জাপার ইশতেহারে পুরো ইস্যুটিই গায়েব। জাপার সমর্থন ছাড়া আওয়ামী লীগের পক্ষে এককভাবে চুক্তি বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের সাথে প্রতারণা করতে এটি আওয়ামী লীগ-জাপার গোপন সমঝোতার ফল কিনা সে সংশয় রয়েছে।

জিয়ার পদাঙ্ক অনুসরণ করে স্বৈরশাসক এরশাদ পুরো পার্বত্য চট্টগ্রামকে সেনা ছাউনিতে পরিণত করেছিলেন। মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে ৪ লক্ষাধিক সেটলারকে পাহাড়িদের জায়গায় পুনর্বাসন, সেনা-সেটলার দিয়ে পাহাড়ি বসতিতে হামলা-দাঙ্গা-নারী ধর্ষণ-হত্যাযজ্ঞ-বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ করে ত্রিপুরায় শরণার্থী হতে বাধ্য করা...এ ধরনের বর্বরোচিত ঘটনার একক "কৃতিত্ব" হচ্ছে স্বৈরশাসক এরশাদের। লংগুদু-ফেনী-মাটিরাঙ্গা-ভূষণছড়া-হীরাচর হত্যাকাণ্ড এরশাদের গলায় পেশাদার জল্লাদগিরির সনদ হয়ে ঝুলছে।

দুর্নীতি ও লাম্পট্যের মূর্ত প্রতীক হলেন এরশাদ। গোটা দেশকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নেয়ার ব্যাপারে তিনি ছিলেন অগ্রণী। শহীদ নুর হোসেন, ডাঃ মিলনকে খুন এবং দেশে দীর্ঘ নয় বছর স্বৈরশাসন জারি রাখার প্রধান হোতা হলেন এরশাদ। মহাজোটে শরীক হয়ে দেশের ভবিষ্যত প্রেসিডেন্ট হবার স্বপ্নে তিনি বিভোর।

দ্বিতীয় অংশ

ইউপিডিএফ-এর প্রার্থী নির্বাচিত হলে নিম্নোক্ত কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য উদ্যোগ নেবেঃ

ক. সাম্প্রতিক ভূমি বেদখল

দেশে জরুরি অবস্থা জারির পর পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি বেদখল মারাত্মক আকার ধারণ করে। উত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম অর্থাৎ খাগড়াছড়ির মাইসছড়ি, মহালছড়ি, কমলছড়ি, হরিনাথপাড়া, দীঘিনালার মেরুং, কবাখালি রাঙ্গামাটি জেলার মারিশ্যার চার কিলো (আসল নাম তদেক মারা কিজিং) ইত্যাদি এলাকায় পাহাড়িদের মালিকানাধীন শত শত একর জমি জোরপূর্বক কেড়ে নেয়া হয়েছে। বহু বছরের কঠোর শ্রমে গড়ে তোলা বাগান-বাগিচা হয় সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে, নতুবা বেদখলকারীরা ভোগ দখল করছে। বাবুছড়ার সাধনা টিলায় অবস্থিত বিহার ধ্বংস করে ৩০০ একর জমি জবরদখলের জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা চালানো হয়।

মধ্য পার্বত্য চট্টগ্রাম অর্থাৎ রাঙ্গামাটির বাঘাইছড়ির সাজেক এলাকায় জমি কেড়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে পাহাড়িদের বেশ কয়েকটি গ্রামে হামলা ও অগ্নি সংযোগ করা হয়। ঘটনার ধারাবাহিকতায় লাদুমনি চাকমা নামে এক ব্যক্তিকে কুপিয়ে খুন করা হয়। নান্যাচর ও লংগুদুতেও ভূমি বেদখল প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে এবং সাম্প্রদায়িক হামলার আশঙ্কায় বহু পাহাড়ি নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে বনে জঙ্গলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়।

দক্ষিণ পার্বত্য চট্টগ্রাম অর্থাৎ বান্দরবানে সেনানিবাস সম্প্রসারণ ও সেনা ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণের নামে হাজার হাজার একর জমি বেদখলের ষড়যন্ত্র চালানো হয়। সামরিক প্রয়োজনে এই জমি অধিগ্রহণ করা হচ্ছে বলা হলেও, তার আসল উদ্দেশ্য হলো পাহাড়িদের নিজ বাস্তুভিটা ও বংশপরম্পরায় ভোগদখল করে আসা জুম-ভূমি থেকে চিরতরে উৎখাত করা। ইতিমধ্যে বান্দরবান শহরের অনতিদূরে চিম্বুক পাহাড়ে মুরুং সম্প্রদায়ের কয়েক শত একর জমি কেড়ে নিয়ে সেখানে তথাকথিত পর্যটন কেন্দ্র "নীলগিরি" নির্মাণ করা হয়েছে। এই অন্যায় জবরদখলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার কারণে জরুরি অবস্থা জারির পর পরই যৌথ বাহিনী ইউপি চেয়ারম্যান রাংলাই মুরুংকে আটক করে।

ভূমি আগ্রাসন হলো জাতিসত্তা নিধনের অপর নাম। ভূমি হচ্ছে একটি জাতির প্রাণস্বরূপ। ভূমি ছাড়া একটি জাতির অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। অথচ এই অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে ইউপিডিএফ ছাড়া আর অন্য কোন দল সংগ্রাম করেনি। সত্য উচ্চারণের খাতিরে এটা উল্লেখ করা দরকার যে, একমাত্র আমাদের পার্টিই জনগণকে সাথে নিয়ে চরম

প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলা করে ভূমি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। সেই চরম দুর্দিনে জনগণ কেবল আমাদের পার্টিকেই কাছে পেয়েছে। আওয়ামী লীগ, বিএনপির মতো গণবিরোধী দলগুলো এই চরম অবিচারের বিরুদ্ধে টু শব্দটি পর্যন্ত উচ্চারণ করেনি। আর যারা আজ এই সব দলের মনোনয়ন পেয়ে নির্বাচনের মাঠে নেমেছে, অসহায় মানুষের দুর্দিনে তাদের টিকিটিও খুঁজে পাওয়া যায়নি। এমনকী আঞ্চলিক পরিষদের গদিতে আসীন জনসংহতি সমিতির শীর্ষ নেতারাও তখন নীরব ভূমিকা পালন করেন। জরুরি আইনে হাত-পা বাধা অবস্থায় কেবল ইউপিডিএফ-ই নিরলসভাবে ও দৃঢ়তার সাথে ভূমি আগ্রাসন রোধ করতে সাধ্যমত চেষ্টা চালায়। পার্টি ও জনগণের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের ফলেই আগ্রাসী শক্তি পিছু হটতে বাধ্য হয়।

আমাদের মনোনীত প্রার্থীকে জয়যুক্ত করা হলে ভূমি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামকে আরো জোরদার করা হবে এবং বেদখলকৃত জমি পুনরুদ্ধারের জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালানো হবে।

খ. অপারেশন "উত্তরণ" ও গণ নির্যাতন

অপারেশন উত্তরণের নামে পার্বত্য চট্টগ্রামে অঘোষিত সেনা শাসন জারি রাখা হয়েছে। চুক্তির মাধ্যমে জনগণের ওপর নিপীড়ন নির্যাতন বন্ধ হয়নি, বরং তা বৃদ্ধি পেয়েছে। চুক্তির পর থেকে আজ পর্যন্ত ইউপিডিএফ-এর শত শত কর্মি সমর্থক ও সাধারণ লোকজনকে বিনা অপরাধে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রাম ঘেরাও, বাড়ি-ঘর তল্লাশী, শারীরিক নির্যাতন, হয়রানি, ভয়-ভীতি প্রদর্শন নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। জরুরি অবস্থার সময় শারীরিক নির্যাতনের কারণে হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে বেশ কয়েকবার। এখনো জনগণ নির্যাতন, গ্রেফতার ও উচ্ছেদের আতঙ্কে রয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে সামরিক নিয়ন্ত্রণমুক্ত করে গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করার কর্মসূচী আওয়ামী লীগ কিংবা বিএনপি কোন দলই নেয়নি। এ সম্পর্কে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের কাছে তাদের কোন নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিও নেই। ইউপিডিএফ-এর মনোনীত প্রার্থী জয়যুক্ত হলে অপারেশন উত্তরণের নামে সেনা শাসন বলবৎ রাখার বিরুদ্ধে সংসদের ভিতরে ও বাইরে লড়াই করবে।

গ. ধর্মীয় নির্যাতন সম্পর্কে

জরুরি অবস্থা জারির পর পার্বত্য চট্টগ্রামে ধর্মীয় নির্যাতন মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পায়। দীঘিনালায় সাধনা টিলা বন বিহারের জমি বেদখল প্রচেষ্টা ছাড়াও, লক্ষ্মীছড়িতে ভুজুলিচুক ভাবনা কেন্দ্রে বেশ কয়েক বার হামলা, বিহার ধ্বংস ও বৌদ্ধ ভিক্ষুদের হয়রানি করা হয়। মহালছড়িতে লিখিত নির্দেশ দিয়ে ধর্মীয় স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সম্প্রদায় যাতে স্ব স্ব ধর্মমত পালন ও চর্চা করতে পারে ইউপিডিএফ সে লক্ষ্যে কাজ করবে।

ঘ. লুটপাট, দুর্নীতি, বৈষম্য ও অপকর্মের বিরুদ্ধে

সারা দেশ আজ দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে। যে দলই ক্ষমতায় গেছে, সে দলের লোকজন

দুর্নীতি ও লুটপাটে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থেকেছে। উজানের ঘোলা পানি যেমন ভাটি এলাকার পানিকেও কলুষিত করে, তেমনি রাষ্ট্রের ক্ষমতাসীনদের দুর্নীতি পার্বত্য চট্টগ্রামেও ঢুকে পড়েছে। সংক্রমিত করেছে সমাজের তথাকথিত উপরতলার চিহ্নিত কতিপয় ব্যক্তি, বিশেষকে। দালালি-চামচাগিরি-দল বদল-ডিগবাজী সবচে' লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয়। বিশেষতঃ বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের আমলে খাগড়াছড়ি থেকে নির্বাচিত সাংসদ কর্তৃক জনগণের সম্পদ দু' হাতে লুটপাট, নিজের পছন্দসই দলীয় লোকজনকে অন্যায় সুযোগ-সুবিধা প্রদান, ঠিকাদারী-ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ, উন্নয়ন প্রকল্প বরাদ্দের ক্ষেত্রে অনিয়ম-বৈষম্য,পাহাড়িদের ভূমি জবর দখল, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধানো, ধ্বংসাত্মক কাজে অর্থ ও উস্কানী প্রদান, মারমা-ত্রিপুরাদের সামাজিক ঐক্য সংহতি বিনষ্টকরণ-বিভিন্ন গোষ্ঠী খাড়া করা, আরো নানান অপকর্ম (যা অকথ্য)--পার্বত্য চট্টগ্রামে এক কালো অধ্যায়।

দলীয় ক্ষমতার ছত্রছায়ায় উক্ত সাংসদ দুর্নীতিবাজ সামরিক ও বেসামরিক আমলাদের হাত রে অর্থ-ক্ষমতা সব কিছু কুক্ষিগত করে উত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম অর্থাৎ খাগড়াছড়িতে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিলেন। তার হাতে নির্যাতিত ও আক্রান্ত হয়ে বিরোধী দলীয় নেতা-কর্মিদের এলাকা ছাড়া হতে হয়েছে।

ইউপিডিএফ মনোনীত প্রার্থী জয়যুক্ত হলে এই লুটপাট ও বৈষম্যের অবসান ঘটাবে এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমতার নীতি গ্রহণ করে নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।

ঙ. ভারত প্রত্যাগত শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু

ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের অনেকে এক দশক পরও এখনো নিজ জমিজমা ও বসতভিটা ফিরে পায়নি। জরুরি অবস্থার সময় দিঘীনালায় পুনর্বাসন বঞ্চিত শতাধিক শরণার্থী পরিবারকে তাদের জমিজমা ফিরিয়ে দেয়ার পরিবর্তে জোরপূর্বক অন্যের মালিকানাধীন জমিতে বসিয়ে দেয়া হয়েছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার কারণে শরণার্থী নেতাদের গ্রেফতার করা হয়েছে। অপরদিকে, আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের কাউকে এখনো পর্যন্ত পুনর্বাসন কিংবা ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়নি। বরং বহিরাগতদেরকেও এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করায় জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। ইউপিডিএফ মনে করে কেবলমাত্র স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদেরকেই আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এজন্য ইউপিডিএফ মনোনীত প্রার্থী নির্বাচিত হলে যথাযথ ভূমিকা পালন করবে।

চ. সেটলার ও রোহিঙ্গা ইস্যু

সেটলাররাও একভাবে শোষণ বঞ্চনার শিকার। তাদের দূরাবস্থাকে পুঁজি করে একশ্রেণীর লোক (তারাও সেটলার) নানাভাবে ফায়দা লুটছে। অতীতে সমতল অঞ্চলে চর দখলের লাঠিয়াল বাহিনী হিসেবে তাদের ব্যবহার করা হয়েছে। বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামে জাতিগত আধিপত্য বজায় রাখার হীন উদ্দেশ্যে পাহাড়িদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়া হয়েছে। পাকিস্তান আমলে বিহারীদের যেভাবে বাঙালি জনগণের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছে, একই কায়দায় সেটলারদের পাহাড়ি জনগণের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়া হয়েছে। এ

ঘৃণ্য দুষ্কর্মের হোতা হচ্ছে এদের দুর্নীতিবাজ গণবিরোধী শাসকচক্র। সাধারণ সেটলারদের সাথে পাহাড়িদের শত্রুতা নেই এবং থাকতে পারে না। কায়েমী স্বার্থবাদীগোষ্ঠী অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে পাহাড়ি এবং সেটলার বাঙালিদের সাথে দ্বন্দ্ব সংঘাত বাধিয়ে রেখেছে। এতে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পাহাড়ি জনগণ, সাধারণ সেটলাররাও সবাই তাতে লাভবান হয়নি, ক্ষয়ক্ষতির শিকার হতে হয়েছে তাদেরও। সেটলারদের মধ্যকার একশ্রেণীর সর্দার (যারা সেটলারবেশী জাতশত্রু) আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে। তাদের অপকর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার কারণে অনেক সাধারণ সেটলারদেরকে বিভিন্ন সময় নির্যাতনের শিকারও হতে হয়েছে। দুর্নীতিবাজ সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তাদের সাথে যোগসাজশ করে সেটলারদের জন্য বরাদ্দকৃত রেশন-অর্থ আত্মসাৎ করে লাভবান হয়েছে সেটলারদের মধ্যকার এ চক্রটি। সেটলার হলেও আসলে এরা কায়েমীস্বার্থবাদী চক্রেরই এজেন্ট। পাহাড়ি ও বাঙালি সেটলারদের মাঝে কৃত্রিম দ্বন্দ্ব সংঘাত বাধিয়ে ফায়দা লুটাই এ চক্রের ব্যবসা। এদের সাথে সাধারণ সেটলারদের স্বার্থ এক নয়, এ কথাটি খুব শান্ত মস্তিষ্কে সেটলারদের বুঝতে হবে। সাম্প্রদায়িক জিগির তুলে এরা নিজেদের অপকর্ম ঢেকে রাখে। অনুরূপ পাহাড়িদের মধ্যকার চিহ্নিত একটি চক্র শাসকগোষ্ঠীর সাথে আঁতাত করে ফায়দা লুটছে। দালালি করে ভাগ্য ফিরাচ্ছে। এরা পাহাড়ি হলেও, পাহাড়িদের বন্ধু নয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগের জন্য দায়ী এরা। পাহাড়ি ও সেটলারদের এদের বিরুদ্ধেই আন্দোলন করতে হবে।

ইউপিডিএফ তার কর্মসূচীতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে: "জাতিগত নিপীড়ন ও উগ্রজাতীয়তাবাদী আধিপত্য প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার হিসেবে সেটলারদের ব্যবহারের বিরোধিতা করা। সমতলে পুনর্বাসন না হওয়া পর্যন্ত তাদের ন্যুনতম মৌলিক মানবিক অধিকার নিশ্চিত করা।"

দক্ষিণ পার্বত্য চট্টগ্রামে অর্থাৎ বান্দরবানে সেটলার সমস্যা ছাড়াও রোহিঙ্গা সমস্যা প্রকট। রোহিঙ্গাদের কারণে বান্দরবান ও কক্সবাজারে সামাজিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিচ্ছে। রোহিঙ্গা ইস্যুটি সমাধানের ব্যাপারে ইউপিডিএফ ইঙ্গিত ভূমিকা পালন করবে।

ছ. জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির বিরুদ্ধে

শাসকগোষ্ঠী পাহাড়ি জনগণের মধ্যে বিভেদ, অনৈক্য ও ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি করে দেয়ার জন্য অত্যন্ত তৎপর। জনগণ যাতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে অধিকার আদায়ের জন্য লড়াই সংগ্রাম করতে না পারে শাসকগোষ্ঠী তা-ই চায়। তারা পাহাড়িদের মধ্যে দালাল-স্পাই সৃষ্টি করে। যখন জনগণের ওপর নির্যাতন চলে, নিজ বাস্তুভিটা ও জমিজমা থেকে লোকজনকে উচ্ছেদ করা হয়, তাদের জায়গা জমি বেদখল করা হয়, তখন নিশ্চুপ ও নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করে এই দালাল চক্র সরকারকে সহায়তা দেয়। জনগণের মাঝে হতাশা ও বিভ্রান্তি ছড়িয়ে মনোবল ভেঙে দিতে তৎপর থাকে। জনগণ যাতে সংগঠিত হয়ে সংগ্রাম করতে ভয় পায় সেজন্য শাসকগোষ্ঠীর শক্তিকে খুব বড় করে উপস্থাপন করে, বিপরীত দিকে জনগণ দুর্বল, আন্দোলন সম্ভব নয়--ইত্যাদি ভাঙ্গনমূলক কথা বলে আর নানান গুজব ছড়ায়। এরা হচ্ছে জনগণের মাঝে সরকারের পুঁতে রাখা মাইনস্বরূপ, এদের নিষ্ক্রিয় করতে না পারা পর্যন্ত সমাজে অনৈক্য ও বিভ্রান্তি বিরাজ করবেই। রাজনৈতিক পরিভাষায় দেরই বলা হয় **'পঞ্চম বাহিনী'**।

অথচ নির্বাচন ঘনিয়ে আসলে এরা বিভিন্ন গণবিরোধী তথাকথিত জাতীয় দলের মনোনয়ন

পাওয়ার জন্য তৎপর হয় ও বিরাট জনদরদী বেশ ধরে মাঠে নামে। এরা এ যাবত জনগণের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খেয়েছে। এদের বিরুদ্ধে সবাইকে সচেতন হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

ইউপিডিএফ চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, মুরুংসহ সকল জাতিসত্তা ও সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালাবে। বাঙালিদের মাঝেও তাদের বিদ্যমান সমস্যা ও অনৈক্য দূর করতে সচেষ্ট থাকবে। গোটা দেশের বৃহত্তর কর্মকাণ্ডে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি-বাঙালি জনগণ যাতে ঐক্যবদ্ধভাবে ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয় ইউপিডিএফ সে মহান লক্ষ্যে নিবেদিত।

জ. সংসদকে লড়াইয়ের ফ্রন্ট হিসেবে ব্যবহার করা

১৯৭৩ সালের পর যারা পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন তারা প্রত্যেকে সংসদে জনগণের আশা আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটাতে ব্যর্থ হয়েছেন। এটা বার বার প্রমাণিত হয়েছে যে, আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টির মতো গণবিরোধী দলের মনোনয়ন নিয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হলে জনগণের পক্ষে কথা বলা যায় না। জনগণের স্বার্থে কাজ করা যায় না। লোগাং গণহত্যা, নান্যাচর গণহত্যা ও কল্পনা চাকমার অপহরণ ঘটনা সারা দেশে ও বিদেশে প্রতিবাদের ঝড় তোলে; অথচ পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে নির্বাচিত আওয়ামী লীগের তিন সংসদ সদস্য সংসদে এ সম্পর্কে একটি কথাও বলেননি। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক ও নিন্দনীয়। আসলে তারা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের প্রতিনিধিত্ব করেননি, তারা প্রতিনিধিত্ব করেছেন আওয়ামী লীগের। আওয়ামী লীগের দলীয় শৃঙ্খলায় ছিলেন তারা আবদ্ধ। অথচ যদি ইউপিডিএফ-এর মতো জনগণের স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী পার্টির কোন সদস্য কিংবা অন্য কোন ব্যক্তি স্বতন্ত্রভাবে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হতেন, তাহলে তিনি স্বাধীনভাবে জনগণের মতামত সংসদে প্রতিফলিত করতে সক্ষম হতেন।

পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, একটি আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের ভ্রান্ত নীতির কারণে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে আওয়ামী লীগ, বিএনপির মতো গণবিরোধী দলগুলো নির্বাচনে জিততে সক্ষম হয়েছে। ইউপিডিএফ মনে করে, আমাদের অতীত থেকে শিক্ষা নিতে হবে; আমরা আর ভুলের বিলাসিতা করতে পারি না। আওয়ামী লীগ, বিএনপি-কে অনেক সুযোগ দেয়া হয়েছে; আর নয়। এবার এমন পার্টি বেছে নিতে হবে যেটি জনগণের পার্টি। এমন ব্যক্তিকে নির্বাচিত করতে হবে, যে নিজের আখের গোছাবে না (নিজ-অ আলুবো ন-কুরিবো) এবং যে জনগণের পক্ষে নিরলসভাবে সংগ্রাম করেছে ও করবে।

ইউপিডিএফ-সমর্থিত প্রার্থী জয়যুক্ত হলে সংসদকে জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য একটি লড়াইয়ের ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করা হবে। সংসদের ভিতরে ও বাইরে জনগণের দাবি-দাওয়া ও আশা-আকাঙ্ক্ষা তুলে ধরা হবে এবং তা আদায়ের জন্য চাপ সৃষ্টি করা হবে। সত্যি বলতে কী, আজ সকল ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য অর্থাৎ জনগণের পক্ষে কথা বলার জন্য ইউপিডিএফ-এর ম্যান্ডেট প্রয়োজন। আপনারা ইউপিডিএফ-কে এই ম্যান্ডেট দিন, ইউপিডিএফ বিশ্বস্ততার সাথে আপনাদের দাবি-দাওয়া তুলে ধরে সংগ্রাম পরিচালনা করবে।

ঝ. উপরোক্ত বিষয় ছাড়াও,
রাজনৈতিক কারণে আটক বন্দীদের মুক্তি মামলা-প্রত্যাহার, উন্নত প্রযুক্তির অপব্যবহার ও অপসংস্কৃতিরোধ, আত্মিক উন্নতি ও সুস্থ বিনোদনের পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে পাড়া মহল্লায় পাঠাগার গড়ে তোলার উদ্যোগগ্রহণ, যুব সমাজকে সংগঠিত করে বৃহত্তর জাতীয় কর্মকান্ডে নিযুক্তকরণ, কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা, কৃষিপণ্য সংরক্ষণে হিমাগার নির্মাণে এলাকাবাসীকে সংগঠিতকরণ, রিক্সা-ঠেলাগাড়ি চালকদের স্বার্থ সংরক্ষণ, ক্ষুদ্র কুটির শিল্প রক্ষা, বন ও বন্য প্রাণী সংরক্ষণ, প্রকৃতি পরিবেশ রক্ষার আন্দোলন জোরদারকরণ, মানিকছড়ি-ফটিকছড়ি সীমান্তে সেমুতাং গ্যাস ফিল্ডসহ দেশের তেল-গ্যাস-কয়লা খনিজ সম্পদ লুটপাটের বিরুদ্ধে আন্দোলন, জাতীয় প্রতিরক্ষায় পাহাড়ি যুবকদের অন্তর্ভুক্তকরণ, পার্বত্য চট্টগ্রামে ভিডিপি-আনসার বাহিনী ভেঙে দিয়ে ইয়ুথ ব্রিগেড গঠনে সরকারকে চাপ প্রদান, পার্বত্য চট্টগ্রামের সীমানা পুনঃনির্ধারণ, প্রতিবেশী দেশের সাথে অমিমাংসিত এলাকা বোঝাপড়া করা, প্রতিবেশী ত্রিপুরা ও মিজোরাম রাজ্যের সাথে সীমান্ত বাণিজ্যের সরকারী অনুমোদন, পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে প্রতিবেশী দেশসমূহের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা এবং কারো আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতিতে ইউপিডিএফ অটল থাকবে।

ঞ. ইউপিডিএফ-এর পক্ষে একটি বার রায় দিন
ইউপিডিএফ ২০০১ সালের নির্বাচনে প্রথমবারের মতো অংশগ্রহণ করেছিল। পার্টিকে সে সময় চরম প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলা করে নির্বাচন করতে হয়েছিল। নির্বাচনী প্রচারণায় হামলা চালানো হলে পার্টির ৫ জন কর্মি ও সমর্থক প্রাণ হারান। তা সত্ত্বেও পার্টি খাগড়াছড়ি আসনে প্রায় ৩৫ হাজারের মতো ভোট লাভ করে। অপরদিকে, রাঙ্গামাটিতে কাউখালি ছাড়া অন্য কোথাও নির্বাচনী সমাবেশ করা সম্ভব না হওয়া সত্ত্বেও প্রায় ১৭ হাজারের মতো ভোট লাভ করে। এতে ইউপিডিএফ-এর প্রতি ব্যাপক জনসমর্থন প্রকাশ পায় এবং তা দেশ বিদেশের পর্যবেক্ষক মহলের নজর কাড়তে সক্ষম হয়।
যারা শত বাধা ও ভয়-ভীতি উপেক্ষা করে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সে সময় পার্টির পক্ষে নির্বাচনী কাজে অংশ নিয়েছেন অথবা ভোট দিয়ে পার্টির প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেছেন, আমরা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। পার্টি মনে করে, আগামী ২৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনেও আবার নবউদ্যমে জেগে ওঠার সময় এসেছে। এবারের নির্বাচনে অবশ্যই জয়লাভ করতে হবে। তাই ভোট যুদ্ধে সামিল হোন। আপনার ভোটাধিকারই হলো এই যুদ্ধের অস্ত্র; এই অস্ত্রকে সঠিকভাবে ব্যবহার করুন। এই অস্ত্র আওয়ামী লীগ-বিএনপির মতো গণবিরোধী দলগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবহার করুন।

- **২৯৮ নং খাগড়াছড়ি আসনে উজ্জ্বল স্মৃতি চাকমাকে ও ৩০০ নং বান্দরবান আসনে ছোটন কান্তি তঞ্চঙ্গ্যাকে হাতি মার্কায় ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করুন**
- **২৯৯ নং রাঙ্গামাটি আসনে না ভোট দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী অযোগ্য প্রার্থীদের প্রত্যাখ্যান করে নতুন নির্বাচনের পক্ষে আপনাদের রায় দিন**